Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 184-194

আফসার আমেদের গল্প: সম্পর্কের জটিল বিন্যাস

ড. লতিফ হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

আফসার আমেদ (১৯৫৯—২০১৮) গল্প লেখেন না, গল্প আঁকেন। তাই কথা তাঁর আখ্যানে অতি সহজেই ছবি হয়ে ওঠে। ষাট-সত্তরের দশক থেকে আশির দশকে যাত্রাকালে বাংলা ছোটোগল্পের গতি-প্রকৃতিতে যখন ক্রমশ পরিবর্তনের ছোঁয়া, হাংরি-শ্রুতি-নিম-ছাঁচ ভেঙে ফেলো-শাস্ত্রবিরোধীর মতো আভাগার্দ-ধর্মী প্রয়াসের শিল্প-সফলতায় প্রশ্ন-চিহ্ন, উত্তাল গণ-আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা, সেখানে দাঁড়িয়ে নতুন যাঁরা লিখতে এলেন, স্বাভাবিক ভাবেই গতিমুখের বদল ঘটেছে। আখ্যান সৃষ্টির নানাবিধ উপাদান, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ছিলই, তবে উপস্থাপনের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বিশেষ দ্রষ্টব্য, যা নতুন নতুন প্রতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। আফসার আমেদের মতো সার্থক 'কিস্‌সা-কার' তো এ যুগেরই আবিষ্কার। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী (জন্ম—১৯৪৬) যথার্থই বলেছেন—

> আশির দশকের মধ্যে বাংলা ছোটোগল্পের আসরে দেখা দিয়েছেন বেশ কয়েকজন শক্তিমান ছোটগল্পকার। প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আবুল বাশার, আফসার আমেদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী। বাস্তব-জীবন-অনুসারী গল্পের ধারায় তাঁরা অবিচ্ছিন্ন কিন্তু গল্পের নির্মাণে অনেক সময়ে তাঁরা বিচিত্রতর, পরিণততর শিল্পী।[১]

আমরাও বলতে পারি বাস্তব জীবন চর্চার প্রথাগত অনুসারী হিসেবে নয়, বরং অভিনব ফর্ম এবং কনটেন্টের বৈচিত্র্যময় বিন্যাসেই আফসার আমেদ হয়ে উঠেছেন বিরল ব্যতিক্রম। শুধুমাত্র ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেই কিন্তু তা সীমাবদ্ধ নয়, *ঘর গেরস্তি, সেই নিখোঁজ মানুষটা, কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক* কিংবা *বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা*—র মতো টেক্সট বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি লেখা হয় নি। সহজসরল কথন-ভঙ্গি নয়, পরাবাস্তবিক স্পর্শ, ক্ষেত্রবিশেষে ম্যাজিক রিয়ালিজম তো রয়েছেই কিন্তু যাবতীয় ন্যারেটিভের মূলে রয়েছে চোখে দেখে অনুভব করার নিরন্তর তাগাদা। যে তাগাদা থেকেই নিছক বিবৃতিকে আপন সৃষ্টি দক্ষতায় আখ্যানে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন আমেদ সাহেব। নিম্নবর্গ এবং নিম্নবিত্তের মানুষ, ছাপোষা মধ্যবিত্তের ফেনোমেনানের বাইরে গিয়েও বলতে পারি, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম লেখকদের কলমে মুসলিম জন-জীবনের চালচিত্র যথাযথভাবে ফুটে ওঠেনি বলে হতাশা প্রকাশ করেন, আমি তাঁদের দলে নেই। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল

বাশার, আফসার আমেদ, সোহারাব হোসেন পড়েও একথা বলা যায় কিনা এতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ইদানীং কালে কেউ কেউ এই গিমিককে ব্যবহার করে সস্তায় জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করছেন। তবে এই ধারার প্রবহমান ছকে আনসারউদ্দিন, নীহারুল ইসলাম, হামিরউদ্দিন মিদ্যা, ইসমাইল দরবেশরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং করছেন।

আখ্যানে লৈঙ্গিক পার্থক্যপ্রীতিকে স্পষ্ট করে দেখাবার প্রয়াস ছিল না আফসার আমেদের। তবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল বিশ্লেষণ এবং প্রতীতির অনিবার্যতা সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তুলেছেন। সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আলো-অন্ধকার, মানসবৃত্তির বহুবিধ চর্চা প্রবৃত্তিগত এবং মনোবৃত্তিগত উভয় রূপকেই স্পষ্ট করে। ১৯৮৯-এর *কালান্তর* শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘আর্তি’ গল্পটি লেখকের অনন্য সৃষ্টি। প্রাথমিক পাঠে মনে হয় গল্পটিতে গ্রামীণ পটভূমিতে কৃষিজীবী পরিবারের চিরাচরিত অসহায়তার চিত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোতাহারের মত প্রান্তিক কৃষকেরা নামমাত্র জমিতে যে ন্যূনতম ফসল ফলায় তাতে সপরিবারের সম্বৎসর খাদ্যের যোগান কার্যত সম্ভব নয়। আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনের এই প্রেক্ষাপট থেকেই গল্পটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকে যাত্রা করে। মোতাহার এবং সালেহার দাম্পত্য সম্পর্কের বাহ্যিক খোলস আপাত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বজায় রাখলেও, বাস্তবে তা অন্তঃসার শূন্য। মোতাহারের হৃদয় জুড়ে অবস্থান করে যৌবনের কাঙ্ক্ষিত প্রেম মাসুরা। কিন্তু তার পারিবারিক দায় ও দায়িত্বের ভিত্তিটি নিতান্ত ঠুনকো নয়। যে কারণে দ্বন্দ্বটিই সত্য হয়ে ওঠে, পারিবারিক কাঠামোটিও ভেঙে পরে না। কেবল ভেতর থেকে মোতাহারকে পীড়া দেয়। সালেহাকে তখন অবাঞ্ছিত বলেই মনে হয়—

> সালেহার পিঠে হাত বোলায় মোতাহার। সালেহা আরো বুকে মুখ গুঁজে দেয় মোতাহারের। মোতাহারের বুকে সালেহার ঠাণ্ডা ঠোঁটের স্পর্শ লাগে। নাক গেঁথে যায়। সালেহা সোহাগে আপ্লুত। মোতাহার সালেহাকে আদর সোহাগ করতে করতে মাসুরার জন্যে বেদনায় ভরে ওঠে ক্রমশ।[২]

গল্প কথক যখন এই বেদনাকে ‘অসহযোগের বেদনা’ বলে উল্লেখ করেন তখন মাসুরার অসহায়তায় তাকে সাহায্য করতে না পারা নাকি শরীরি সম্পর্কের কামনা-বাসনা—পাঠকের মনেও এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। শেষ বাক্যে ধান ও জ্যোৎস্নার উল্লেখের সাপেক্ষে কেউ কেউ একে ফার্টিলিটি কাল্টের সাপেক্ষেও মিলিয়ে পড়তে চান। ‘স্বামীপ্রেমিকের কাছে পত্র’ গল্পে কানিজা এবং জয়নালের দাম্পত্য সম্পর্ককে ভিন্নতর আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন কথাকার। সাত বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে ছেড়ে তিনমাস স্বতন্ত্র যাপন করেছে জয়নাল। স্ত্রী মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামে দুবছরের পুত্রকে নিয়ে, জয়নাল কাজের সূত্রে বাইরে, অবশ্যই কর্ম-সংস্থানের তাগাদায়। পরিযায়ী কর্মজীবীর দূরত্ব যাপন যেমন হয়। তবে নায়ক জয়নালের প্রোষিতভর্তৃকার দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রেমের বিচ্ছেদ জনিত বেদনাই প্রার্থিত ছিল। অথচ পর পর নয়টি চিঠিতে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে পারিপার্শ্বিকতা। গল্পের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে

আমরা অনুভব করি, বস্তুত নায়িকা কানিজার এহেন অবস্থান কার্যত অভিমান। পাঠকের মনে পড়বে—'তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে।' ভালোবাসায় দূরত্বটুকু আবশ্যিক। প্রেমে অপেক্ষার গুরুত্বকে কি অস্বীকার করা যায়! *আজকাল* শারদীয় ১৯৯৩—এ প্রকাশিত হয় 'সঙ্গ' গল্পটি। মতিন-মরিয়মের বিবাহিত জীবন তিরিশ বছর অতিক্রান্ত। এই ত্রিশ বছর মরিয়মের জীবনকে জ্বালিয়ে খাক করেছে মতিন। ছেলে-মেয়ে সহ ভরা সংসারকে প্রায় একা হাতেই আগলে রেখেছে মরিয়ম। মতিন সেখানে উদাসীন। মরিয়মের মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়ার বিপ্রতীপে মতিন সংসারের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি অভিমানবশত মৌলবি বেশে পাড়ি দেয় হুগলীর কোনও এক প্রান্তিক মসজিদে ইমামতি করবার লক্ষ্যে। এই নিভৃতবাস ধর্মবোধের তাগাদায় নয়, পারিবারিক দায়বোধকে উপেক্ষা করবার উদাসীনতায়। তবুও যাবতীয় যন্ত্রণাকে মেনে নিয়েই মরিয়মের অভিপ্রায় মানুষটি কাছেই থাকুক, পারিবারিক ছত্রছায়াতেই চাপা থাক যাবতীয় সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত। মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর ছাপোষা পারিবারিক জীবনে নিরন্তর অভিযোজনের ইতিবৃত্ত এই আখ্যান। 'হাসিনার পুরুষ' গল্পে লেখক অস্তবাদী দর্শনের দ্বারাই প্রভাবিত বলেই মনে হয়। মূল চরিত্র হাসিনা অস্তিবাদের ফসল। নিম্নবিত্ত মানুষের নিরন্তর জীবনযুদ্ধের ছবি গল্পটির মূল ভরকেন্দ্র। হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের দিকটিও তাতে বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ। হাসিনা, সুবল, সামন্ত, ফতিমা, কাশ্মীরা, হানিফ, কুদ্দুস, নারানদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণই শ্রম নির্ভর, দিন আনা দিন খাওয়ার। তবে সেখানে মধ্যবিত্ত সুলভ স্বার্থপরতা নেই। সহানুভূতিরা জীবন্ত। হাসিনার স্বামী ছিল কাসেম। ভরা সংসার ছিল। ট্রেনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কাসেমের। হাসিনার কাছে সে জীবন বিস্মৃতপ্রায়। সে নতুন জীবন পেতে চায়। সালাম তার প্রার্থিত প্রণয়-পুরুষ। সুবল এবং হাসিনার পারস্পরিক মেলামেশায় প্রবৃত্তিজাত তাড়না আছে, তবে তা অভাব বোধের পরিপূরক নয়, যে পরিপূরক হতে পারত সালাম। আখ্যানের শেষ অংশে আম খাবার দৃশ্যটি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত তা সহজেই অনুমেয়। যেন কিছুটা পুরুষতন্ত্রের বলয়মুক্ত নারীর প্রতিবেদন। নিরন্তর বোধ তাড়িত নিঃসঙ্গ এক মানুষের গল্প 'সুখ-অসুখ'। এই নিঃসঙ্গতা 'একা-জনিত' নয়, স্ত্রী-পুত্র সহ সাংসারিক জীবনের পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও অলীক বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত—

> এই বছর বিয়াল্লিশ বয়েসে এই মনখারাপ অনেকটা অসুখের মতো। বাড়িতে স্ত্রী সুরমা আছে, ছেলে রৌম্য আছে। বাড়িটিও নিজের তৈরি।... এই মনখারাপের নির্দিষ্ট কারণ নেই। খুঁজেও পায় না। মনে হয় যেন কিছু নেই, কেউ নেই তার।[৩]

অলীক পারভার্টেড নয়, তবে তার দাম্পত্য সম্পর্কে একঘেঁয়েমি আছে। তাই মনে মনে কামনা করত কোনও ভিন্ন নারীকে, যার সঙ্গ তার এই একঘেঁয়ে জীবনযাত্রায় মুক্তির আস্বাদ এনে দেবে। অলীকের জীবনে হঠাৎ প্রবেশ করে জয়তী। তবে তারা পূর্ব পরিচিত। সম্পর্কের জটিল হিসেবে নন্দদার স্ত্রী জয়তীও সন্তোষপুরের ফ্ল্যাট কালচারে অভ্যস্থ নিঃসঙ্গ মানুষ। বৌদি-দেওরের আপাত সামাজিক খোলস ত্যাগ করে অলীক-জয়তী পরস্পরের কাছে আসতে চেয়েছে। মিথ্যের

আড়ালে নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে তারা মিলিত হয়েছে। সম্পর্কের বৈধত্ব নিয়ে প্রথাগত সামাজিক প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু কীসের নিরিখে, কোন মানদণ্ডে নির্ধারিত হবে সম্পর্কের ন্যায়-নীতি তাও প্রশ্নাতীত নয়, একমাত্রিক তো নয়ই। নীতি-বাদীদের চোখ রাঙানী স্বাভাবিক কিন্তু যখন পরকীয়া বিচার ব্যবস্থায় মান্যতা পায়, তখন বুঝে নিতে হবে পারস্পরিক সহাবস্থানই সম্পর্কের অব্যাজ হেতু নয়, প্রয়োজন পরিতৃপ্তির, সেটা মানসিক এবং শারীরিক দ্বিবিধ আকরেই। আফসার আমেদ কখনোই এরোটিক প্রেমের চালচিত্র আঁকেন নি। তবে পিপাসার্ত মানুষের হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলেছেন অবলীলায়। ন্যায়-নীতি এবং শৃঙ্খল ভঙ্গের বাইনারিটি সেখানে অবিচল। এই গল্পেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গল্পে আলো-অন্ধকারের প্রসঙ্গটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের শেষ পদে অলীক মনে যখন প্রশ্ন জাগে— 'নিজের বাসনাকে খুঁজে পেলে অলীকের মনে হয়, সে এত স্বার্থপর কেন? তার কি অসুখ করেছে?'[১] এই প্রশ্নেই নিহিত থাকে নীতিবাদী শুদ্ধতার মূলসূত্রটি। বস্তুত এ প্রশ্ন তো আমাদের সকলেরই, প্রতিটি মানুষই কি পলিগ্যামী নয়! ১৯৮৮ সালে শারদীয় *পরিচয়*—এ প্রকাশিত হয় 'সমুদ্রের নিলয়' গল্পটি। আখ্যান পটভূমি সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপ। বছর আঠারোর আলেয়া একরকম বাধ্য হয়েই পিতৃসম বছর পঞ্চাশের গহর আলিকে বিয়ে করে। গহর আলির প্রথম পক্ষ লালমন বিবি। আমরা লক্ষ করব সপত্নী কলহের চিরাচরিত আখ্যান এ নয়, বরং সম্পর্কের জটিল আবর্তে লেখক, আলেয়ার ব্যক্তিগত টানাপোড়েনকেই গল্পের থিম হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আলেয়ার প্রণয় পুরুষ ছিল গাজি। কিন্তু গাজির উদাসীনতায় সম্পর্কের পরিণতি সম্ভব হয় নি। আলেয়ার তাতে আক্ষেপ নেই কারণ গহরের আশ্রয়ে ভবিষ্যতের নিশ্চিত ভিত্তি রয়েছে। শারীরিক সম্পর্কে বয়সের ব্যবধান প্রকট হলে, ফেলে আসা অতীত তাতে প্রলেপ দেয়। গাজি তাই মানসিক স্তরেই বিদ্যমান। কিন্তু আখ্যানের বাঁক বদল ঘটে যখন দেখা যায় আলেয়ার সতীন কন্যা মাসুরার সঙ্গেই গাজি নতুন করে প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। কন্যাসম মাসুরা এবং পূর্ব-প্রেমিককে একসূত্রে মেনে নিতে পারে না আলেয়া। মৃত প্রেমের জীবাশ্মেই বেঁচে থাকার রসদ খুঁজেছে সে, অথচ বাহ্যিক এই জটিলতা গ্রাস করছে অবশিষ্ট আহ্লাদ—

> বসে বসে দাহ অনুভব করে আলেয়া। একটি মুহূর্তে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে গাজি। গাজি মাসুরার সঙ্গে কেন প্রেম করবে? এটা ঘটতে দেয়া যেতে পারে না। অন্য কেউ নয়, সে তো গাজি। গাজি তার পূর্ব-প্রেমিক। এখনো কি দেখার টান ছিল না উভয়ের মধ্যে? যেটুকু অবশেষ ছিল, সেটুকুকেই গোপনে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেখানে ঢুকে পড়েছে মাসুরা। মাসুরাকে ভুলিয়ে ফেলেছে গাজি। এক অসহায়তা বিপন্নতা এসে আলেয়াকে আলোড়িত করে।[৪]

'কুড়ি বছর' শীর্ষক গল্পে দীর্ঘ কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে বিনতা নিজেকে নিয়ে ভাববার অবকাশ পায়নি। বিয়ের প্রথম দু-এক বছরের স্মৃতিকে ভর করেই জীবনের পথ চলা। পারিপার্শ্বিক সংকট, দারিদ্রতা, সন্তান পালন, দায়-দায়িত্বের বহরে ব্যক্তিগত সুখ-আহ্লাদ ক্রমশ

ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। বিনতার কাছে স্বামী নবকৃষ্ণ যেন কোনও মনুষত্বহীন পুরুষ। যে মানবিকতা ধরে রাখবার কেউ নেই। সংসারে থেকেও সে নিষ্প্রাণ, নির্জীব। নবকৃষ্ণ বিনতাকে কখনোই বোঝে নি, কুড়ি বছরের জীবনে বিনতা কেবলই নীরব দর্শক। প্রতিবেশী সুভাষ সেনের অবস্থান বিনতাকে ভাবিয়েছে। নবকৃষ্ণ ব্যাতিরেকে সে জেগে উঠতে চেয়েছিল, নবকৃষ্ণকে অস্বীকার করেই। কিন্তু সে ভাবনার নির্দিষ্ট কোনও তল নেই। ব্যক্তিক অভিলাষ দ্বান্দ্বিক সীমায় আবদ্ধ, তা অশ্রু কাতর, অন্ধকার আচ্ছন্ন। আফসার আমেদ এভাবেই বাহ্যিক সক্রিয়তার অন্তরালে সম্পর্কের আলো—আঁধারি সহাবস্থানকে নির্মাণ করেন। আশালতা এবং অন্নপূর্ণার পারস্পরিক কাহিনিতেই পূর্ণতা পেয়েছে ‘মেয়ের মা’ গল্পটি। অন্নপূর্ণা বিবাহবিচ্ছিন্না। স্বামী বনমালীর দ্বিতীয় স্ত্রী করুণাকে নিয়ে স্বতন্ত্র বাস। কন্যা আশালতাও স্বামী সুভাষকে ত্যাগ করে ফিরে এসেছে অন্নপূর্ণার গৃহে। আশালতা প্রতিবাদী, সে চেয়েছে নারীর যোগ্য সম্মান। অন্নপূর্ণা প্রথাগত সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। বনমালীর স্বেচ্ছাচারিতাকে মাথা পেতে নিয়েই বরং অপেক্ষা করেছে তার ফিরে আসবার। গল্পের শেষ অংশে আমরা দেখব সুভাষ স্ত্রী আশালতাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। বনমালী কিন্তু ফেরে নি। জামাইয়ের আগমনে অন্নপূর্ণাকে উচ্ছ্বসিত দেখায় না, বরং তার অপেক্ষার সমুদ্রে স্রোত এনে শুন্যতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মা ও মেয়ের এই আপাত বাইনারিকে আঁকতে গিয়ে আফসার আমেদ ‘মা’ চরিত্রটিকে অস্তিবাদের সাপেক্ষেই নির্মাণ করেছেন। ‘অভিসার’ গল্পে দীপা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার। অসম ক্ষমতার সম্পর্ক নির্ভর পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ অর্ণব স্ত্রী দীপাকে হীনতর বলেই মনে করে। দীপা প্রাত্যহিক অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাবার লক্ষ্যে তাপসের সঙ্গ নেয় এবং গৃহত্যাগ করে। দীপা তাপসকে প্রেম প্রস্তাব দিলেও, তাপস অপ্রস্তুত, কার্যত দ্বিধাগ্রস্থ। অর্ণব প্রতিশোধ স্পৃহা বশত তাপসকে আঘাত করে। গল্পের শেষে পাঠক যখন মিলনাত্মক পরিণতিকে আবশ্যিক বলে মেনে নেন, সেখানেই আখ্যানের বাঁক বদল ঘটে। দীপা সকলের অজান্তেই নিরুদ্দেশ হয়। দীপার গন্তব্য শেষ অবধি পুরানো সংসারেই কিনা, কথাকার নিশ্চিত কোনও লক্ষ্যকে এখানে আঁকেন নি। প্রথাগত সামাজিকতাকে বদলে না ফেলবার নিজস্ব ঢঙেই আখ্যানকার শেষ বাক্যে কাহিনির গতিমুখ বদলে দিতে চেয়েছেন। এতে পুনরাবৃত্তির একঘেঁয়েমি থাকলেও বিষয়ের বহুমাত্রিকতায় এবং সম্পর্কের জটিল ফেনোমেনোলজিতে তা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এখানেই আফসার আমেদ অনন্য। ‘অন্ধকার স্টেশন’ গল্পের মনোময় এবং সুগতা নিঃসন্তান দম্পতি। সাংসারিক অপূর্ণতা, বাৎসল্য সম্পর্কের অপ্রাপ্তিজনিত আকাঙ্ক্ষা তাদের গ্রাস করে। মনোময়ের আপাত বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎই প্রবেশ করে অদিতি নামের এক যুবতি। বয়সের তারতম্যের তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক পিতা-কন্যার। অদিতির সঙ্গ মনোময়ের কাছে বন্ধুত্বের। কাহিনির পরিণতি অপূর্ণ, তবে সম্পর্ক হারানোর ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্পে বিচ্ছেদের সুর স্পষ্ট। ‘ভালো না লাগার কিছু’—তে লেখক পাশাপাশি দুটি দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি এঁকেছেন। অমিত এবং সুবর্ণা নিঃসন্তান, তাতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কোনও দোলাচলতা নেই। বরং

সে সম্পর্ক ভালো থাকার, ভালো রাখার, ভালোবাসার তো বটেই। অন্যদিকে প্রলয় এবং অন্তরার ছেলে মেয়ে নিয়ে ভরা সংসার। তবুও বয়স বাড়লে যেভাবে সম্পর্কের আকাশে কালো মেঘ আসে, তাদের মাঝেও তেমনি বিরক্তির নিরিখগুলি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। প্রলয়ের উদাসীনতা, অসচেতনতায় অন্তরা ব্যথিত হয়। কথাকার বয়সের ব্যবধানে বদলে যাওয়া সম্পর্কের সমীকরণকে মেলাতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন—

> এই মাঝবয়েসের দাম্পত্য বড়োই জটিল। শ্রাবণের আকাশের মতো। কখন মেঘ করে, কখন করে না, বোঝা মুশকিল। অনুমান করা কঠিন। কোনোকিছু ব্যাপারে ঝগড়া হলে মেটেও না সহজে। যৌবনে যখন থাকত, যৌবনের বাসনা সে-সব মিটিয়ে দিতে পারত, শেষমেশ একটা মধুর নিষ্পত্তি হত।[৫]

আনন্দ বাজার পত্রিকা—য় ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় 'নীল ডুরে শাড়ি আর এলো খোঁপা' শীর্ষক গল্পটি। নতুন ভাড়া বাড়িতে সোহিনীকে নিয়ে নতুন সংসার গড়েছে সুহাস। অথচ সোহিনী সুহাসের বিয়ে করা স্ত্রী নয়। সোহিনীর নিজস্ব সংসার আছে, স্বামী আছে। এমনকি তিন বছরের সন্তানকেও ছেড়ে আসায় কোনও দ্বিধা নেই সোহিনীর। 'অভিসার' গল্পের দীপার মতো সোহিনীও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার। আখ্যানে অনীক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক ব্যক্তিগত অভিপ্রায়কে উত্থাপন করেছে বলেই মনে হয়। পেশায় শিক্ষক অনীক সোহিনীর অবস্থানের বিরোধিতা করে নি, বরং সোহিনীর যন্ত্রণাময় সংসার যাপনকে একরকম উপেক্ষা করেই ফিরে ফিরে যেতে চেয়েছে সোহিনীর শৈশবে। নীতিবাদী শুদ্ধতার নির্ধারিত মাপকাঠিতে নয়, বরং হৃদয়বৃত্তিকে মান্যতা দিতে গিয়েই আফসার আমেদ সোহিনীদের নির্মাণ করেন।

'উপদ্রুত অঞ্চল' গল্পে রাজীব স্ত্রী নন্দনাকে খুন করবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। পেশায় নার্স নন্দনা স্বামীর এই ইচ্ছেতে বিস্ময় প্রকাশ করে নি, বাহ্যিক প্রতিরোধও গড়ে তোলে নি। নন্দনা আঘাত করেছে রাজীবের ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে। নন্দনার কাছে রাজীবের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াকলাপ মিথ্যে বলে মনে হয়। প্রবহমান সামাজিক ক্ষত, মূল্যবোধহীনতা, প্রতারণা, ধর্ষণ, চুরি, প্রবঞ্চনা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ক্ষমতা দখলের লড়াই, দুর্নীতি সবটা নিয়েই প্রাত্যহিক পথ চলা। কিন্তু কেউই এর দায়মুক্ত নয়। এই ধ্বংসের দায়ভাগে সকলেই সমান অংশীদার। সামাজিক অবক্ষয় করাপ্ট করেছে দাম্পত্য সম্পর্কের অন্দর মহলকেও। রাজীব ও নন্দনার মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় থাকলেও, প্রতিনিয়তই জন্ম নিয়েছে ঘৃণাবোধ। বাহ্যিক মিথ্যেই দুর্বৃত্তের মতো ফাটল ধরিয়েছে সম্পর্কের সোপানে। 'আত্মপ্রতিকৃতি' গল্পে অতীশ অফিস ফেরৎ বাসে জনা দশেক নারীর মুখোমুখি হয়। তারা প্রত্যেকেই গৃহবধূ অথচ দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। দালাল চরিত্র সখা তাদের সঙ্গে কাস্টমারের সংযোগ করিয়ে দেয়। সখার মাধ্যমেই অতীশ মীনাক্ষীর সঙ্গে যাত্রা করে। মধ্যবিত্ত অতীশ সাংসারিক জীবনে অভ্যস্থ, ভেতরে ভেতরে কামুক। তাই স্ত্রীকে উপেক্ষা

করে বেশ্যা যাপনে তার মনে কোনও অনুশোচনা নেই। আশ্চর্যের এই, তার স্ত্রীর নামও মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর গৃহে পৌঁছে অতীশ লক্ষ করে তারও সন্তান আছে, স্বামী রোগাগ্রস্থ, লাং ক্যান্সারে আক্রান্ত। অতীশকে সামনে বসিয়েই মীনাক্ষী একে একে তার গৃহকর্ম সম্পাদন করে। অতীশের মধ্যে শরীর যাপনের ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে সে যখন স্ত্রী মীনাক্ষীর মুখোমুখি হয়, তখন জানতে পারে সখা তার স্ত্রীরও পরিচিত। অতীশের উপলব্ধিতে কোথাও বেশ্যা মীনাক্ষী এবং তার স্ত্রী মীনাক্ষী মিলেমিশে যায়। সারাদিনের ঘটনার সঙ্গে স্ত্রী মীনাক্ষীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মিলে যেতে থাকে। আপাত অ্যাবসার্ড মনে হলেও, অতীশ যখন বলে—'তোমার মধ্যে আমার কামনা খুঁজে পাই বলে। কিন্তু তোমার আর আমার ভালোবাসা মিথ্যা। বেশ্যা আর বাবুর ভালোবাসা মিথ্যে যেমন।'[৬] আমরা আসলে প্রতি নিয়ত অভিনয় করে চলি। সম্পর্ক যাপনে যে অভিনয় নেই—এ কথা গাঢ় সুরে বলতে পারি না। কেউ কেউ স্বামী বা স্ত্রীর বাহ্যিক কাঠামোয় সাংসারিক সহাবস্থানকে বজায় রাখলেও, ভেতরে ভেতরে চলে ভাঙন। সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে মান্যতা দিয়েই সাঙ্গ হয় অভিনয়ের পালা। ভালোবাসাও ক্ষেত্র বিশেষে অভিনয়। স্বেচ্ছায় দেহ ব্যবসায় ক'জন রাজি হয়! সমাজই তাকে বেশ্যা বানায়। এই ক্ষত সারাবার দায় নেই সমাজের। অতীশরা কেবল ভোগ করতে চায়। অতীশের মেরুদন্ডহীন সম্পর্ক কেবলই অবয়ব নির্ভর। আফসার আমেদ এই কামুক মানুষদের চালচিত্রকেই সাবলীল ভাবেই জীবন্ত করে তোলেন তাঁর আখ্যানে। ২০০৫-এ *আনন্দবাজার পত্রিকা*—য় প্রকাশিত 'সন্ধ্যাবাসরের কথকতা' গল্পেও উঠে এসেছে একদল কামুক পুরুষদের ইতিবৃত্ত। আয়েসা বিবাহ বিচ্ছিন্না। আয়েসার স্বামী জাফর পেশায় স্কুল শিক্ষক, বিবাহিত হয়েও স্কুল ছাত্রীকে বিয়ে করবার দায়ে তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আয়েসার বিচ্ছেদের কারণও তাই, বিবাহ বিচ্ছিন্না অপর এক যুবতি হালিমার সঙ্গে সে প্রান্তিক এক গ্রামে বসবাস করে। পুরুষ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এ যেন তীব্র প্রতিবাদ। আয়েসার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে নাসিম সেখানে উপস্থিত হয়। আশ্চর্যজনক ভাবে সেখানে আসাদের উপস্থিতি লক্ষ করে। আসাদ, নাসিম, আয়েসা, জাফর— এরা প্রত্যেকেই ছিল সহপাঠী। তিনজন পুরুষেরই কাঙ্ক্ষিত নারী ছিল আয়েসা। জাফর—আয়েসার সংসার ভেঙে গেলে আসাদ এবং নাসিম আয়েসার কাছে এসেছে একটু উষ্ণতার খোঁজে। এদের পারস্পরিক আকর্ষণ নিশ্চয়ই স্যাপিওসেক্সুয়াল নয়, তারা কেবলই কামনার দাস। গল্পে সাপের উপস্থিতি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। নারী–পুরুষ ভেদে সেক্স ডিফারেন্সকে লেখক সযত্নে অঙ্কন করেছেন। 'সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ হচ্ছে' গল্পে কাহিনির উপস্থাপন কিছুটা ভিন্ন। রূপঙ্কর এবং মহুয়ার দাম্পত্য সম্পর্কে আপাতভাবে বাহ্যিক কোনও দ্বন্দ্ব নেই। তবে প্রতিবেশী অনন্তর বৌ মিষ্টির মৃত্যুকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এটা খুন নয় আত্মহত্যা। মৃত্যুতে মহুয়া শঙ্কিত হলেও, রূপঙ্করের মধ্যে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। মহুয়ার অনুপস্থিতিতে রূপঙ্করের মনে হয়েছে স্ত্রী সংসর্গে থাকায় দৈনন্দিন এক অভ্যস্ততা আছে কিন্ত বিলাসিতা নেই। দাম্প্যত্য সম্পর্কে অপ্রাপ্তি, বিচ্ছিন্নতা আফসার আমেদের গল্পে বারবার ঘুরেফিরে আসে, যে কারণে

বিষয়গত পুনরাবৃত্তি বিশেষ লক্ষণীয়। পরিচারিকা আরতির অবস্থান এবং তার প্রতি রূপঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি রহস্যময়। তবে ওয়াঙ্কার ওয়াইয়ের ‘ইন দ্য মুড ফর লাভ’ চলচিত্রের অনুষঙ্গ এবং এর টেকনিক্যাল প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘সন্ধ্যার মেঘমালা’ গল্পে শোভানের স্ত্রী রুকসানার মৃত্যু ঘটে দুর্ঘটনায়। বছর পঁয়তাল্লিশের শোভান দ্বিতীয়বার আফসানার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আফসানা বিধবা। শোভানের প্রথম পক্ষের কন্যা নেহা। বয়স শোভান এবং আফসানার সুস্থ সম্পর্কে প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ নেহার শিক্ষক মনোদীপের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। সচেতন পাঠক মাত্রই মার্কিন নারীবাদী চিন্তক ক্যারন গিলিগান কথিত ‘কো ফিলিং’ এর প্রসঙ্গ মনে আসবে। নৈতিক শুচিতা, দৈহিক শুচিতা, সমাজ নির্দিষ্ট শৃঙ্খলের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারা- না পারার দ্বন্দ্বকে লেখক দেখান স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই। তবে আফসানারা হয়ে ওঠে প্রথা বিরুদ্ধ, তারা প্রতিবাদী, তারা ব্যতিক্রমী, স্রোতের বিপরীতেই তাদের পথ চলা। অবশ্যই লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টির ফসল। ‘বিরহ’ গল্পে সইফু এবং তার স্ত্রী বদরনের বিচ্ছেদ ঘটে অদ্ভুত ভাবে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অবর্তমানে বদরনকে বিয়ে দেওয়া হয় বিপত্নীক হানিফের সঙ্গে। সইফু ফিরে এসে দেখে তার প্রিয় মানুষটি অন্যের স্ত্রী। আশ্চর্য এই যে, সইফুর যন্ত্রণা আছে ঠিকই কিন্তু নিজস্ব কোনও প্রতিবাদ নেই। সমাজ আরোপিত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে হাঁটতে পারে নি, বরং পারিপার্শ্বিকতার বদলের সাপেক্ষেই সম্পর্কের গতিবিধি বদলকে সে আপোষে মেনে নিয়েছে। তবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকেও অস্বীকার করবার কোনও জায়গা নেই। হিন্দু-মুসলিম বৈবাহিক সম্পর্কের ছবিও এঁকেছেন আফসার আমেদ। ‘একটি গিটার’ গল্পে নেহা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের কন্যা। পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়েই সে হিন্দু পরিবারে যাত্রা করেছে, রুদ্রকে সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে। ভাই আবিদের সমর্থন যদিও তার পক্ষে। ‘লাভ জিহাদের’ প্রবহমান রাজনৈতিক তরজার বাইরে গিয়েও উভয় ধর্মের পারস্পরিক সহাবস্থান কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে বৈবাহিক সম্পর্কের ঘটমান বাস্তবতাকে নস্যাৎ করা যায় কি! আলোচ্য গল্পে যদিও এর উল্টোটা ঘটেছে। ধর্মের বাইরে মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন কথাকার। গিটারের সুর কার্যত জীবনের সুর, প্রাণের স্পন্দন হয়ে উঠেছে।

আজকাল পত্রিকায় ২০০২ সালে প্রকাশিত হয় ‘প্রেম’ শীর্ষক গল্পটি। মধ্য চল্লিশের শিলাদিত্যের সঙ্গে কণিকার সতেরো বছরের সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই এই বন্ধুত্ব। অথচ তাদের কেউই নিজেরদের ব্যতীত পরস্পরের পরিবারের কাউকেই চেনে না বা সে সম্পর্কে জানতে চায় না, প্রয়োজন বোধও করে না। তাদের এই সম্পর্ক কারোরই সংসারে কোনও ছায়াপাত ঘটায় না। কণিকাকে নিয়ে শিলাদিত্যের মধ্যে তেমন কোনও দুর্বলতা নেই। স্ত্রী রমাকে নিয়েই তার সর্বস্ব যাপন। কিন্তু কণিকার অনুপস্থিতি শিলাদিত্যকে ভাবায়। মাঝে মাঝে স্পর্শ ইচ্ছে যে জাগে না তা নয়—

> ওরা কিন্তু হাত ধরাধরি করে হাঁটে না। হাত ধরার সম্পর্কে ওরা থাকে না। শিলাদিত্য কণিকার হাত ধরতে পারে না। অথচ ইচ্ছে তৈরি হয়। এই সম্পর্কের বোধ মুহূর্ত মাত্র। জীবনে এসে মেশে না। জীবন নষ্ট করে না। অদ্ভুত এই সম্পর্ক।[৭]

পাশাপাশি পথ চলায় কণিকার প্রতি উদাসীন শিলাদিত্য চিন্তিত হয় অসুস্থ স্ত্রী রমার কথা ভেবে। সচেতনে দেখতে পায় কণিকা অদৃশ্য। বাহ্যিক সম্পর্কের খোলস নয়, ভেতরে ভেতরে অটুট থাকে সাংসারিক দায়। 'নষ্ট দুপুর' গল্পে সৌরভ স্ত্রী স্বস্তিকা ও কন্যা মৌকে শ্রীরামপুরে রেখে কর্মসূত্রে কানপুরে থেকেছে। স্ত্রীর আড়ালে অনিন্দিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যদিও অনিন্দিতা বিয়ে করে। আবীর তার সদ্যজাত সন্তান। গল্পকারের ভাষায়—

> একজন পাঁচবছর বিয়ে করেছে, আর একজন দেড় বছরে বিয়ে করেছে। তাতে অনেক তফাত। সৌরভ তো পাঁচ বছর। দাম্পত্যে অনেক ফাঁক থাকে, ফাঁকিরও অবকাশ থাকে। যেমন কানপুরে দু বছর কাটিয়ে আসার ব্যস্ততা গুঁজে দেওয়া গেল। কিন্তু অনিন্দিতা শাশ্বতর সে অবকাশের বয়স হয়নি, হয়নি পচনের বয়স। তারা একসঙ্গে কাটায় আসঙ্গে, লিপ্সায়। কীভাবে কাটায়? তার আলো অন্ধকার অনুভব করতে পারে শুধু সৌরভ, তার সত্যের কাছে পৌঁছতে হয়তো পারে না।[৮]

হঠাৎ দুপুরে সৌরভ অনিন্দিতার মুখোমুখি হয়। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা সন্তানের প্রতি উদাসীনতায় বোঝাতে চায়, সেও সাংসারিক জীবনে সুখি নয়। আফসার আমেদের গল্পের প্রথাগত কন্টেন্ট এখানে অব্যাহত। শারদীয় *আজকাল* পত্রিকায় ১৯৪৪-এ প্রকাশিত অপর একটি গল্প 'দুই বোন'। পরবর্তী কালে গল্পটি *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৯) এবং *সেরা ৫০টি গল্প* (২০১২) গ্রন্থেও সংকলিত হয়। যদিও পূর্বে আলোচিত একাধিক গল্পের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যুবতি আর্জিনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তারই দুলাভাই ইয়ারু। সে তার প্রতিপত্তির প্রভাবে বশ করে আর্জিনার পিতাকে। দিদি তহমিনা বিবির জীবন কেবল যৌনতা এবং গৃহকর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রান্তিক মুসলিম জীবনের চালচিত্র এই গল্প নিশ্চয়ই। কিন্তু তার সাপেক্ষে সামগ্রিক মুসলমান জীবনকে মিলিয়ে ফেলা কাঙ্ক্ষিত নয়। ইয়ারুর হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এ জাতীয় উপস্থাপন গভীর ব্যঞ্জনাবাহী। বন্দি তহমিনাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংসারের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। ইয়ারু কেবল বিনোদনের পাত্রে পরিণত হয়। ভোক্তৃ—ভোগ্যা সম নয়, সে ক্ষেত্রে পুরুষ—প্রকৃতিও কি অসম! শাসক এবং শাসিতের এই আপাত বৈপরীত্বের বিপ্রতীপে আফসার আমেদ নারী মুক্তির কথা বলেছেন। সমাজ দেহের dispersion free state সম্পর্কে তিনি সচেতন এ কথা নিশ্চয়ই বলবার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৯২-এ *কালান্তর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুই নারী' গল্পের নাসিরাকে পাঠকের মনে পড়বে কিংবা ১৯৮০-তে শারদীয় *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত 'গোনাহ' গল্পের ফরিদাকে। আখ্যানে লেখকের কনফেশনের ক্ষেত্রটিকেও স্পর্শ করতে পারলেই অন্তঃপাঠে পৌঁছানো সহজ হয়ে যায়। লিঙ্গবাদী

সমাজ ব্যবস্থায় প্রেম চিরকালই নির্বাসিত, তা ঠিক তবে নান্দনিক অনুভূতিগুলিকে অস্বীকার করি কীভাবে? 'গোনাহ'-র পাপ-বোধ কি কেবল বাহ্যিক চাদর! মিলাদ মহফিলের অনুষঙ্গেও মালেকের ফেনোমেনানকে, তার ক্রিয়াকলাপকে কীভাবে বিচার করব আমরা! 'ছুঁচ'-এর উপস্থিতি এখানে তাৎপর্যপুর্ণ। যৌনতা বিষয়ক আগ্রহোদ্দীপক স্টেটমেন্ট এখানে নেই। তবে নীতিবাদী শুদ্ধতার ভণ্ড মুখোশগুলিকে চিনে নেবার উপায়কে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ২০০৯ সালে *আজকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আশ্চর্য সাক্ষাৎকার' গল্পটি। সহাবস্থানই সম্পর্কের ভিত্তি, শারীরিক মৃত্যুতে যন্ত্রণা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সাময়িক দহন কাটিয়ে সম্পর্কের পরিণতি শেষ অবধি কেবল স্মৃতিই, আবার সময়ের ব্যবধানে এই স্মৃতিও ক্রমশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেতে থাকে। নির্বাণ, মৌমিতা, আরণ্যক, নবনীল, শ্যামাঙ্গী সকলেই সহপাঠী। মৌমিতা আরণ্যককে বিয়ে করে। শ্যামাঙ্গীর প্রতি নির্বাণের দুর্বলতা থাকলেও, শ্যমাঙ্গী ভালবাসত নবনীলকে। নবনীলের মৃত্যুর পর নির্বাণ এবং শ্যামাঙ্গীর সাক্ষাৎকারকেই আখ্যানের পটভূমি হিসেবে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কের পরিণতি দিয়েছে কিনা, তার স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত আখ্যানকার তুলে ধরেন নি। কথকের বয়ানেই আমাদের বুঝে নিতে হয় গল্পের মূল সুরকে— 'মৌমিতাকে গভীর ধাঁধায় ফেলে নির্বাণ ও শ্যামাঙ্গী হো হো করে হাসতে লাগল। যে হাসির মধ্যে নবনীলের কোনও স্মৃতির ছিল না।'[৯]

পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ কিংবা প্রথাগত মুল্যবোধকে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার পাশাপাশি একটি বিকল্প অনুসন্ধানের প্রয়াসও আমরা আখ্যানগুলিতে গভীরভাবে লক্ষ করি। ক্ষমতা বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাসের এই সমানুপাতিক কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাস্তানুপাতিক সংযোগকে লেখক আধুনান্তিক প্রেক্ষিতেই নির্মাণ করেন। মানসিক টানাপোড়েন, সামাজিক ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধের উৎস স্থলগুলিকে লেখক চিহ্নিত করেন। দেশজ রিচ্যুয়াল কিংবা পরম্পরাগত ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রকেও আফসার আমেদ জীবন্ত করে তোলেন। প্রতিষ্ঠান নির্ভর শাসন কাঠামোটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'মন নিরপেক্ষ জৈবসত্তা' এবং 'মন সাপেক্ষে জৈবসত্তা'-র আপাত দ্বন্দ্ব সচেতন পাঠক মাত্রই লক্ষ করবেন। যেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ। প্রায় তিন শতাধিক গল্প লিখেছেন আফসার আমেদ। আলোচ্য গল্পের পাশাপাশি 'জনস্রোত, জলস্রোত', 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন', 'শীতজাগর', 'নোঙর', 'পাথর, পাথর', 'রাত কত হল?', 'ঘরের কথা', 'অপ্রেম আবরণ', পাণিগ্রহণ', 'ডিপ্‌টিউবওয়েলের দাম কত?', 'আদিম', 'হাড়', 'অন্ধগলির রূপকথা', 'নিরুপায় অলৌকিক', 'খাঁচার পাখি', 'কল্পভাবনার অধিকার', 'তেইশ বছর', 'আত্মপক্ষ', 'খুনের অন্দরমহল', কিংবা 'এলাটিং বেলাটিং সই লো'-এর মতো গল্পগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে থাকবে, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সমস্ত গল্পের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আলোচ্য নিবন্ধে কেবল প্রাসঙ্গিক কিছু সূত্রকে তুলে ধরা হল যা আফসার আমেদের ছোটোগল্পের সামগ্রিক পাঠে পৌঁছতে সহায়ক হয়ে উঠবে।

তাঁর বেশ কিছু গল্পের পরিণাম অনতিস্পষ্ট বলে সমালোকদের কেউ কেউ দাগিয়ে দিতে চান, পাশাপাশি এও স্বীকার করেন যে, আফসার আমেদ গল্পের বাস্তবতার বা গল্পাংশের সীমারেখা ছাড়িয়ে গিয়ে মানব-সম্পর্কের অনন্ত সম্ভাবনার মুক্ততায় তাঁর গল্পকে পৌঁছে দেন।[১০] তবে শুধু মুসলমান সমাজের চালচিত্রের যথার্থই রুপকার হিসেবেই নয়, এর বাইরেও নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে আফসার আমেদ পাঠ করা যায়, অনুভব করা যায়। প্রথাগত ধরনের বাইরে গিয়ে তিনি নারী-পুরুষের ‘আঁতের কথা’-কে স্কেচ করতে পারেন দেখানোর নিজস্ব কৌশলকে অবলম্বন করেই।

তথ্যসূত্র ও উৎস নির্দেশ:-

১. চক্রবর্তী, সুমিতা, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ৯১

২. আমেদ, আফসার, *সেরা ৫০টি গল্প,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ১১৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

৪. আফসার, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১০৫

৫. আমেদ, আফসার, *সেরা ৫০টি গল্প,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৪০৩

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০

১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ৯২